HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৫ • সংখ্যা ১ • মার্চ ২০০৭
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৪

বেসরকারি-উন্নয়ন সংস্থাকর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি সেবা

পৃষ্ঠা ১০

বাংলাদেশে রোটাভাইরাস 'এ'-এর মোলেকুলারের ধরন

পৃষ্ঠা ১৭

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

# বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়া যায় নি

প্রতিবেশী দেশ ভারতে যখন চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব/সংক্রমণ চলছিলো তখন সেখান থেকে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস বাংলাদেশে আসতে পারে এমন ধারণা করেছিলেন স্থানীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ২০০৬ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকার দু'টি সার্ভিলেন্স এলাকা থেকে জ্বরজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত ১৭৫ জন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং আইজিএম এন্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমে চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রে (সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন) পাঠানো হয়। এতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ (৭৪%) রোগীই জ্বর এবং/অথবা হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা (জয়েন্ট পেন) ও ফুসকুড়িজনিত (রেস) অসুস্থতায় ভুগছিলো। তবে চিকুনগুনিয়া সংক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তাদের অনেকে ডেঙ্গু-আক্রান্ত ছিলো।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস হচ্ছে মশাবাহিত একটি আলফাভাইরাস, যার শারীরিক উপসর্গগুলো অনেকটা ডেঙ্গু জ্বরের মতই।

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

রোগীরা জ্বর, হাড়ে ব্যথা, মাথাব্যথা, ফুসকুড়ি এবং কদাচিৎ রক্তক্ষরণের মত সমস্যায় ভুগে থাকে। ১৯৫২ সালে তাঞ্জানিয়ায় সর্বপ্রথম এর অস্তিত্ব সনাক্ত করার পর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় (১-৩)। গত সাত বছরে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় এবং অতি-সম্প্রতি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলসহ ভারতের কয়েকটি প্রদেশে এই ভাইরাসের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে (৪-৭)।

অত্র অঞ্চলে চিকুনগুনিয়ার সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে স্থানীয় চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন যে, বাংলাদেশেও হয়তো এটি ছড়িয়ে পড়েছে। এই অনুমান সঠিক কি না তা পরীক্ষা করার জন্য দু'টি পৃথক সার্ভিলেন্স কর্মসূচি থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ২০০৬ সালের ১৩ থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ 'রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (ইনস্টিটিউট ফর ইপিডেমিওলোজি, ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ)-এর গবেষকরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে জ্বরজনিত অসুস্থতা নিয়ে আসা দুই বছরের কম-বয়সী শিশুদের ওপর এক সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এসময় ১২২ জন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যাদের শরীরে তাপমাত্রা (জ্বর) ছিলো ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি এবং শরীরে ফুসকুড়ি এবং/অথবা হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা ছিলো। এছাড়া ফুসকুড়ি অথবা হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা নেই অথচ জ্বরজনিত অসুস্থতা আছে এমন ৪৬ জনের রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। জ্বরজনিত অসুস্থতা নিয়ে চলমান সার্ভিলেন্স কর্মসূচির অংশ হিসেবে আইসিডিডিআর,বি-র গবেষকরা ঢাকার কমলাপুরের 'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাভিত্তিক সার্ভিলেন্স' এলাকা থেকেও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। ২০০৬ সালের ২৭ জুন থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত জ্বর ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথায় আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম-বয়সী সাতজন রোগীর কাছ থেকে তাদের অসুস্থতার সময় এবং সুস্থ হওয়ার পরে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সর্বমোট ১৭৫ জন রোগীর সিরাম নমুনা যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং সেগুলো থেকে চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু ভাইরাসের এন্টিবডি সনাক্ত করার জন্য আইজিএম এন্টিবডি ক্যাপচার এলাইজা দ্বারা পরীক্ষা করা হয় (এমএসি-এলাইজা), যা বিশেষভাবে ডিইএনভি-২ অথবা সিএইচআইকেভি ভাইরাস সনাক্তকরণের জন্য প্রযোজ্য। সংক্ষেপে, সিরাম-এর নমুনা এবং ইতিবাক ও নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ নমুনাসমূহ (পজিটিভ অ্যান্ড নিগেটিভ কন্ট্রোল স্যাম্পলস্) ১:৪০০ অনুপাতে ত্রিগুণ (ট্রিপলিকেট) করে পরীক্ষা করা হয়। প্লেটগুলো ছাগলের অ্যান্টি-হিউম্যান আইজিএম দ্বারা প্রলেপ (কোট) দিয়ে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাতভর তাপ (ইনকিউবেট) দেওয়া হয়। এরপর ফসফেটযুক্ত নিরপেক্ষ (ফসফেট-বাফার্ড) স্যালাইন দিয়ে সেগুলোকে ব্লক করা হয়, যাতে রয়েছে ০.৫% টোয়েন ২০ এবং ৫% ননীমুক্ত গুড়োদুধ। কার্যকর বা অকার্যকর অ্যান্টিজেন দিয়ে ধাপে ধাপে আইজিএম এন্টিবডি নিরুপণ করা হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে ফ্লেভি ভাইরাস বা আলফা ভাইরাস গ্রুপ রিঅ্যাকটিভ মনোক্লোনাল এন্টিবডি যুক্ত করে হর্সরেডিস পারঅক্সাইডের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এইচআরপি-র কার্যক্ষমতা সনাক্তকরণের জন্য ৩,৩' ৫,৫'-টেট্রামিথাইল বেনজিডিন (নিওজেন কর্পোরেশন, লেক্সিনটন, কেওয়াই) বিক্রিয়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো এবং তা মাইক্রোপ্লেট রিডারের ৪৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে নির্ণয় করা হয়েছিলো।

কোনো রোগীর মধ্যেই চিকুনগুনিয়া ভাইরাস পাওয়া যায় নি (সারণি ১)। তবে সর্বমোট ২১ জন রোগীর রক্তে ডেঙ্গু ভাইরাসের আইজিএম এন্টিবডি পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জ্বর, ফুসকুড়ি এবং/অথবা হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসার জন্য আসা ১৫% রোগীও ছিলো।

*সারণি ১: ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কমলাপুরে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিকে আসা রোগীদের চিকুনগুনিয়া এবং ডেঙ্গু ভাইরাস পরীক্ষার ফলাফল (জুন-আগস্ট ২০০৬)*

| রোগসম্পর্কিত বিবরণ রোগের নিদর্শন/লক্ষণ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল | | কমলাপুর ক্লিনিক |
|---|---|---|---|
| | ফুসকুড়ি এবং/অথবা হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথাসহ জ্বরের রোগী | জ্বর | জ্বর এবং হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা |
| নমুনা হিসেবে নেওয়া মোট রোগী | ১২২ | ৪৬ | ৭ |
| চিকুনগুনিয়া (সংখ্যা, %) | ০, ০% | ০, ০% | ০, ০.% |
| ডেঙ্গু (সংখ্যা, %) | ১৮, ১৫% | ২, ৪% | ১, ১৪% |

প্রতিবেদক: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার এবং সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র, আটলান্টা, জিএ এবং ফোর্ট কলিন্স, সিও ইউএসএ

*মন্তব্য*

এ-গবেষণা থেকে ঢাকায় চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে অবশ্যই এ-গবেষণার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ, এই গবেষণা শুধুমাত্র ঢাকায় পরিচালিত হয়েছে এবং দেশের অন্যত্র উক্ত ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকতেও পারে। তাছাড়া, নমুনা হিসেবে যেসব রোগী নেওয়া হয়েছিলো তাদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিলো না এবং যেসব সার্ভিলেন্স কার্যক্রম থেকে এসব রোগী নেওয়া হয়েছিলো সেগুলোর কোনোটিই পরিকল্পিতভাবে ডেঙ্গু অথবা চিকুনগুনিয়া ভাইরাস-আক্রান্ত রোগী সনাক্তের জন্য করা হয় নি। ভারতে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস ক্রমাগত বিস্তারের ফলে (৪,৮) বাংলাদেশেও এর সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি মাথায় রেখে চিকিৎসক ও সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সজাগ থাকা দরকার। উভয় ভাইরাস নির্ণয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না নিলে চিকুনগুনিয়া-আক্রান্ত রোগীদেরকে ভুল করে ডেঙ্গু রোগী হিসেবে সনাক্ত করা হতে পারে।

২০০১ সালে বাংলাদেশে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি সর্বপ্রথম সনাক্ত হলেও আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্নভাবে প্রমাণ পেয়েছি যে, ১৯৯৬ সালের আগে থেকেই এখানে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়িয়ে ছিলো (৯,১০)। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রকোপ আগে যেমন সবসময় ছিলো (এনডেমিক) এখনো তা অব্যাহত রয়েছে এবং বিশেষ করে ঢাকায় এটি ব্যাপকভাবে মারাত্মক অসুস্থতার (মরবিডিটি) কারণ হয়ে থাকতে পারে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিশেষ সার্ভিলেন্স কার্যক্রম উভয় প্রকার ভাইরাসজনিত রোগতত্ত্বের বিষয়টি অনুধাবন করতে আমাদেরকে আরো সাহায্য করবে।

*তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন*

# বেসরকারি-উন্নয়ন সংস্থাকর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি সেবা

ল্যাবরেটরি-সেবা সার্থকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করে। আমরা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকর্তৃক পরিচালিত কিছু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্বাচন করে তাদের ল্যাবরেটরি-সেবাসমূহ বিশেষজ্ঞদের সুপারিশকৃত ল্যাবরেটরি-সেবার সাথে তুলনা করেছি। গ্রামীণ কোনো ক্লিনিকে ল্যাবরেটরি-সেবা ছিলো না। শহুরে যেসব ক্লিনিকে ল্যাবরেটরি-সুবিধা ছিলো সেগুলোর বেশিরভাগেই প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র, জৈব-নিরাপত্তা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ছিলো। বর্তমান ক্লিনিকসমূহে ল্যাবরেটরি-সুবিধা চালু করতে হলে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং পদ্ধতিসহ সেগুলো চালু করা উচিত।

ল্যাবরেটরি-সেবাসমূহ অতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উন্নত দেশসমূহের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ল্যাবরেটরির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ, রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার পূর্বাভাস-সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নশীল দেশসমূহেও সম্ভব, তবে এক্ষেত্রে সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য, যা সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগ নির্ণয় করা হয় প্রধানত রোগীর সমস্যা এবং রোগের ইতিহাস সম্পর্কে জেনে, এবং শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে (১)। রোগ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার ভূমিকা এখানে কতটুকু তা অনেকাংশে অজানা। অপরিহার্য ওষুধসমূহের একটি সর্বসম্মত তালিকা থাকলেও কী কী সুবিধা নিয়ে একটি ল্যাবরেটরি-ক্লিনিক গঠিত হতে পারে (যেসব সুবিধার কার্যকারিতা এবং দক্ষতা ব্যবহারিক গবেষণা এবং প্রমাণনির্ভর পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণিত), সেসম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে (২)।

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকের ল্যাবরেটরিসমূহে কী কী সুবিধা আছে এবং এগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি কী রকম তা আরো ভালভাবে বোঝার জন্য দেশব্যাপী ইউএসএআইডির অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সেবা প্রদান কর্মসূচির (এনএসডিপি) আওতাধীন ক্লিনিকসমূহে একটি বিস্তারিত ক্রস-সেকশনাল গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণার জন্য এনএসডিপি ক্লিনিকসমূহ বিবেচনা করার পিছনে যেসব যৌক্তিকতা ছিলো সেগুলো হলো – ১) গঠন আকৃতির দিক থেকে ক্লিনিকসমূহ ছিলো একই ধরনের; ২) সারা দেশব্যাপী ক্লিনিকসমূহের অবস্থান; ৩) তথ্য সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা; এবং ৪) অব্যাহতভাবে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা (৩)। তিনশত একুশটি চালু এনএসডিপি ক্লিনিকের মধ্যে (গ্রাম ও শহরে) মাত্র ১৮টি ক্লিনিক সনাক্ত করা হয় যেগুলোতে ল্যাবরেটরি-সুবিধা ছিলো এবং সেগুলোর সবকটিকেই এ-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গ্রামীণ কোনো ক্লিনিকেই ল্যাবরেটরি-সুবিধা ছিলো না। এছাড়া, ক্যাচমেন্ট এলাকার রোগীদের রোগের লক্ষণ এবং ধরন সম্পর্কে জানার জন্য গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকা থেকে দৈবচয়নেরভিত্তিতে ৬০টি ক্লিনিককে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয় (২৩টি শহুরে এবং ৩৭টি গ্রামীণ), যেগুলোতে ল্যাবরেটরি সুবিধা ছিলো না। পূর্ববর্তী এক বছরে প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের রোগীদের ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপি থেকে তাদের রোগের ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ব্যবস্থাপত্রের অনুলিপিসমূহে সেবাপ্রদানকারীদের দ্বারা সনাক্তকৃত রোগের লক্ষণ এবং/অথবা রোগসম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত ছিলো। আমরা ব্যবস্থাপত্র থেকে রোগের লক্ষণ এবং রোগসম্পর্কিত তথ্য উভয়ই সংগ্রহ করেছি এবং পরে সেগুলোকে শ্রেণী বিভক্ত করেছি। একজন ডাক্তার এবং একজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান নিয়ে গঠিত দু'জনের একটি দল তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের দ্বারা ল্যাবরেটরি-কর্মীদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সেবা-প্রদানসংক্রান্ত জিনিস-পত্রের তালিকা তৈরি এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ল্যাবরেটরির দু'দিনের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

*সারণি ১: রোগীদের ক্লিনিকে আসার দশটি প্রধান কারণ*

| রোগনির্ণয়/লক্ষণ | % মোট সংখ্যা=১৯,৭৯৩ | % গ্রামীণ সংখ্যা=১০,১৯১ | % শহুরে সংখ্যা=৯,৬০২ |
|---|---|---|---|
| গর্ভাবস্থা (এএনসি) | ২৪ % | ২৫ % | ২২ % |
| কাশি/শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রমণ | ১১ % | ১০ % | ১২ % |
| মাসিক বন্ধ থাকা | ৭ % | ৮ % | ৭ % |
| যোনিপথ থেকে নিঃসরিত স্রাব | ৬ % | ৮ % | ৪ % |
| উদরাময় রোগসমূহ | ৬ % | ৫ % | ৪ % |
| চর্মসংক্রান্ত সমস্যা | ৫ % | ৫ % | ৪ % |
| জ্বর | ৫ % | ৪ % | ৫ % |
| পেটে ব্যাথা (ইপিগ্যাসট্রিক পেইন) | ৫ % | ৫ % | ৪ % |
| কৃমিরোগ | ৪ % | ৪ % | ৫ % |
| রক্ত স্বল্পতা | ৩ % | ৫ % | ২ % |

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহের জন্য সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহের প্রকাশিত ফলাফলের ওপর ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। যেসব গবেষণার ফলাফলের ওপর অনুসন্ধান চালানো হয়, সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিলো আত্মগত বা বিষয়ভিত্তিক, এবং পরীক্ষার নির্ভরশীলতা, যথার্থতা অথবা অর্থনৈতিক সুবিধার বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখা হয় নি। বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত প্রারম্ভিক (বেজলাইন) পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে সনাক্তকৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর ওপর অভিজ্ঞ ল্যাবরেটরি বিশেষজ্ঞ, কর্মসূচি বিশেষজ্ঞ এবং নীতি-নির্ধারকদের মতামত নেওয়া হয় (সারণি ২)। এরকম দু'টি পরীক্ষার তালিকা তৈরি করা হয় যাদের একটি গ্রামীণ এবং অন্যটি শহুরে ক্লিনিকসমূহের জন্য প্রযোজ্য। এরপর এ-পরীক্ষা পদ্ধতিগুলো বর্তমানে এনএসডিপি ক্লিনিকসমূহে ল্যাবরেটরি-সুবিধাসহ চালু পরীক্ষা-পদ্ধতিসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখা হয় (সারণি ২)। ল্যাবরেটরি-সুবিধা রয়েছে এমন ক্লিনিকসমূহে সনাক্তকৃত পরীক্ষাগুলো সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি তালিকা এবং সেগুলোর সহজলভ্যতা সারণি ৩-এ দেখানো হয়েছে।

*সারণি ২: প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের জন্য সুপারিশকৃত ল্যাবরেটরি-পরীক্ষাসমূহ*

| সুপারিশকৃত পরীক্ষাসমূহের নাম | গ্রামীণ সেবাদানকেন্দ্র | শহুরে সেবাদানকেন্দ্র | শহুরে ক্লিনিকে বিদ্যমান পরীক্ষাসমূহ (%) |
|---|---|---|---|
| ১. মূত্রের এলবুমিন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ১০০ |
| ২. মূত্রের সুগার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ১০০ |
| ৩. মূত্রের অনুবীক্ষণিক পরীক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ৬৭ |
| ৪. মূত্রের ভৌতিক (ফিজিক্যাল) পরীক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ৬৭ |
| ৫. মূত্রের গর্ভনিশ্চিতকরণ পরীক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ১০০ |
| ৬. মলের রুটিন পরীক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ৬১ |
| ৭. রক্তের এইচবি% | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ১০০ |
| ৮. রক্তের গ্রুপিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ১০০ |
| ৯. এএফবি-র জন্য থুথু পরীক্ষা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ৫৫ |
| ১০. রক্তের সুগার | না | হ্যাঁ | ৮৩ |
| ১১. এইচবিএসএজি | না | হ্যাঁ | ১০০ |
| ১২. আরপিআর | না | হ্যাঁ | ৮৯ |
| ১৩. সিরাম বিলিরুবিন | না | হ্যাঁ | ৬১ |
| ১৪. এএলটি/এসজিপিটি | না | হ্যাঁ | ০ |
| ১৫. কমিপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি) | না | হ্যাঁ | ৬ |
| ১৬. ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট নির্ণয়ের জন্য রক্তের ফিল্ম পরীক্ষা (এমপি) | না | হ্যাঁ | ২৮ |
| ১৭. উইডাল পরীক্ষা | না | হ্যাঁ | ৫০ |
| ১৮. সিরাম কোলেস্টেরল | না | হ্যাঁ | ০ |

*সারণি ৩: গ্রামীণ এবং শহুরে সেবাদানকেন্দ্রসমূহের জন্য সুপারিশকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা*

| সুপারিশকৃত যন্ত্রপাতি | যন্ত্রপাতি আছে (সংখ্যা=১৮) |
|---|---|
| **সব স্থাপনার জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি** | |
| - অনুবীক্ষণ যন্ত্র | ৭৮ % |
| - শালির হিমোগ্লোবিনোমিটার | ৮৩ % |
| - পাইপেটিং ও ডিসপেন্সিং-এর জন্য যন্ত্রপাতি | ৬১ % |
| - অটোক্লেভ এবং/অথবা প্রেসারকুকার | ৮৯ % |
| - রেফ্রিজারেটর | ৮৯ % |
| **শহুরে স্থাপনাসমূহের জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি** | |
| - ওজনমাপক যন্ত্র | ৬ % |
| - সেন্ট্রিফিউজ | ৯৪ % |
| - কালারিমিটার | ৭২ % |
| - মিক্সার এবং রোটেটর | ৪০ % |
| **সব স্থাপনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ল্যাবরেটরি-সংক্রান্ত জিনিস-পত্র** | |
| - টেস্ট স্লাইড | ৯৪ % |
| - মিক্সিং স্টিক | ২৮ % |
| - মলের নমুনা সংগ্রহের পাত্র | ৩৯ % |
| - কভার স্লিপ | ৮৯ % |
| - ক্যালিব্রেশন চার্ট | ০ % |
| - ক্রোমাটোগ্রাফি পেপার | ০ % |
| - গ্লাস স্লাইড | ৯৪ % |
| - স্টিরার | ০ % |
| - ফ্লাক্স | ২৮ % |
| - একবার ব্যবহারোপযোগী সিরিঞ্জ ও সূঁচ | ১০০ % |
| - টেস্ট টিউব | ১০০ % |
| - মূত্রের নমুনা সংগ্রহের পাত্র | ৭৮ % |
| - বুনসেন বার্নার | ২২ % |
| **শহুরে স্থাপনাসমূহের জন্য অতিরিক্ত ল্যাবরেটরি-সংক্রান্ত জিনিস-পত্র** | |
| - ইমপ্রুভড নিওবাওয়ার হেমোসাইটোমিটার | ৫৬ % |
| - কাউন্টিং চেম্বার কভার গ্লাস | ৫৫ % |
| - প্লেটিলেট গণনার জন্য কাউন্টিং চেম্বার | ৫৬ % |
| - ওয়েস্টারগ্রিন ইএসআর পাইপেট | ১০০ % |
| - ওয়েস্টারগ্রিন ইএসআর স্ট্যান্ড | ১০০ % |
| - পাইপেট/ক্যালিব্রেটেড ক্যাপিলারিস | ৫৬ % |
| - ডব্লিউবিসি পাইপেট | ৬১ % |
| - হ্যান্ড কাউন্টার | ১৭ % |
| - স্টেইনিং র‍্যাক | ৫৬ % |
| - টাইমার | ৭২ % |
| - ইডিটিএ | ২২ % |
| - সেন্ট্রিফিউজ টিউব | ৮৯ % |
| - ল্যানসেট | ১০০ % |
| - ব্লোটিং পেপার | ০ % |

সারণি ৪-এ জীবাণুমুক্তকরণ এবং বর্জ্য অপসারণ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সেগুলো ব্যবহারের সুবিধা কোন ল্যাবরেটরিতে কতটুকু আছে সে-সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। মাত্র ১০টি ল্যাবরেটরিতে (৫৬%) জিনিস-পত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিলো। এগুলোর মধ্যে ছয়টিতে অটোক্লেভ ছিলো। মাত্র দু'টি ল্যাবরেটরি থেকে জানা গেছে যে, তারা সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত জিনিস-পত্র সংরক্ষণ করেছিলো। সঠিকভাবে সংরক্ষণ বলতে এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো– জীবাণুমুক্ত জিনিসগুলো একটি জীবাণুমুক্ত সার্জিক্যাল বা এধরনের কোনো পাত্রে রেখে পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা। সবগুলো ল্যাবরেটরি থেকেই জানা গেছে যে, তারা মাত্র একবার ব্যবহার উপযোগী সূঁচ দিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছে। সতেরটি ল্যাবরেটরি থেকে জানা যায় যে, তারা কেউই ব্যবহৃত সূঁচগুলোকে ফেলে দেওয়ার পূর্বে রিক্যাপ, বাঁকা বা ভেঙ্গে ফেলে নি। মাত্র সাতটি (৩৯%) ল্যাবরেটরি ব্যবহৃত সূঁচগুলোকে ছিদ্র-প্রতিরোধক পাত্র ব্যবহার করে অপসারণ করেছে। একটিমাত্র (৬%) ল্যাবরেটরিতে মেডিকেল এবং সাধারণ বর্জ্য/আবর্জনা রাখার জন্য ভিন্ন পাত্র ছিলো। সতেরটি (৯৪%) ল্যাবরেটরি ইনসিনারেটরের মাধ্যমে তাদের শক্ত আবর্জনা (তরল বা বায়বীয় নয় এমন) পুড়িয়ে ফেলেছে, তবে হাতমুখ ধোয়ার বেসিনে অথবা শৌচাগারের মধ্য দিয়ে তারা শরীর থেকে নির্গত তরল পদার্থসহ অন্যান্য তরল বর্জ্য অপসারণ করেছে।

*সারণি ৪: জৈব-নিরাপত্তা এবং বর্জ্য অপসারণ-সংক্রান্ত ১৮টি ল্যাবরেটরির অবস্থা*

| কার্যাবলির নাম | জৈব-নিরাপত্তা এবং বর্জ্য অপসারণ-সংক্রান্ত সুবিধা সংখ্যা (হার) |
|---|---|
| সংক্রমণ প্রতিরোধ-সংক্রান্ত নির্দেশিকা | ৩ (১৭%) |
| পূর্বপ্রস্তুতি-সংক্রান্ত সর্বজনীন প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন | ২ (১১%) |
| নমুনা সংগ্রহের আগে ও পরে হাত ধোয়া | ১৫ (৮৩%) |
| ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় গ্লাভস ব্যবহার | ৬ (৩৩%) |
| ল্যাবরেটরিতে জীবাণুনাশক ব্যবহার | ১৬ (৮৯%) |
| জীবাণু বিনষ্ট করার জন্য ক্লোরিন দ্রবণ ব্যবহার | ৬ (৩৩%) |
| পুনরায় ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরে ক্লোরিন দ্রবণে ভিজিয়ে রাখা | ১ (৬%) |
| জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে যন্ত্রপাতি পরিস্কার করা | ১ (৬%) |
| হাতে গ্লাভস পরে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা | ১২ (৬৭%) |

অভ্যন্তরীণ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব বিষয় অর্ন্তভুক্ত ছিলো, সেগুলো হলো – কোনো নমুনার পরীক্ষার ফলাফল অস্বাভাবিক মনে হলে তা পুনঃপরীক্ষা করা (৯৪%), সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে সঠিকভাবে নমুনা সংগ্রহ নিশ্চিত করা (১০০%), পাত্রের গায়ে সঠিকভাবে লেবেল লাগানো

(৮৯%), সুপারভাইজারের কাছে প্রতিবেদন পেশ (৮৩%), ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকর্তৃক নজরদারি (৭৮%), নমুনাগুলো দ্রুত ল্যাবরেটরিতে পাঠানো (৭৮%), যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পরিদর্শন (৯৪%) এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ (৭২%)। তবে ল্যাবরেটরি-কর্মীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্ধারিত পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন কি না তা দেখার জন্য কোনো ক্রস-নিরীক্ষা করা হয় নি। পরীক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য (বাইরের কোনো ল্যাবরেটরি থেকে) একটি ল্যাবরেটরি তাদের পরীক্ষীত নমুনাসমূহ একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলো; এগারটি (৬১%) ল্যাবরেটরি তাদের তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা পরিদর্শনের মাধ্যমে, ১২টি (৬৭%) সেবাগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি যাচাইয়ের মাধ্যমে, ১৫টি (৮৩%) নির্দিষ্ট বিরতিতে নিরীক্ষণের মাধ্যমে, ৮টি (৪৪%) সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি দ্বারা এবং ৫টি (২৮%) গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি দ্বারা তাদের পরীক্ষাসমূহের গুণগত মান যাচাইয়ের কথা বলেছে।

প্রতিবেদন: ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন এবং হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য:ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), ঢাকা

*মন্তব্য*

স্বাস্থ্যসেবাসম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে জনস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ল্যাবরেটরি-সেবাসমূহের উপকারিতা সম্পর্কে পুনরায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে।

অপরিহার্য ল্যাবরেটরি-সুবিধাসমূহ এবং যন্ত্রপাতির একটি সর্বসম্মত তালিকা ব্যবহার করে এনএসডিপি ল্যাবরেটরিসমুহের ওপর পরিচালিত এ-সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য ল্যাবরেটরিসমূহে অবকাঠামো, অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলো না। কোনো ল্যাবরেটরিতেই গবেষণার নমুনাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। পরীক্ষাসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য একটি সম্পূর্ণ তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি থাকা উচিত। মারাত্মক সংক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতিসমূহের অভাব একটি চিন্তার বিষয়, কারণ উন্নত পদ্ধতিসমূহের অভাবে অন্যান্য স্থানে যেসব খারাপ অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার ফলে রক্তবাহিত সংক্রমণ ছড়িয়েছে (৪,৫)।

সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ থেকে মানুষ অনেক উপকৃত হতো, তবে তার জন্য প্রয়োজন মান-নিয়ন্ত্রণের উন্নত ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে বর্জ্য বা আবর্জনা অপসারণ এবং ল্যাবরেটরি-কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

*তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন*

# বাংলাদেশে রোটাভাইরাস ‘এ’-এর মোলেকুলারের ধরন

বিশ্বব্যাপী উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশসমূহে শিশুদের মারাত্মক ডায়রিয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোটাভাইরাস। এ-রোগের ফলে সৃষ্ট বড় ধরনের সমস্যা রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন উৎপাদন-সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচেষ্টায় ইন্ধন যুগিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে মার্ক অ্যান্ড কোম্পানি উৎপাদিত রোটাটেক এবং গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন উৎপাদিত রোটারিক্স রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন দু'টি প্রয়োগের ওপর বড় ধরনের একটি নিরাপদ পরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং প্রধান রোটাভাইরাস জি-এর বিরুদ্ধে এগুলো উচ্চমাত্রায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনকর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৬ সালের মে পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালের সার্ভিলেন্সে আগত রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত মলের নমুনায় (৪৭১টি নমুনা) যাদেরকে রোটাভাইরাসে আক্রান্ত দেখা গেছে তাদের ১০% রোগীর ওপর জি এবং পি জেনোটাইপিং পরীক্ষা করা হয়েছে। রোটাভাইরাসের জি১পি[৮] (৩৬.৪%) এবং জি৯পি[৮] (২৭.৭%) জীবাণুসমূহ ছিলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী, তবে ২০০৪-২০০৫ রোটাভাইরাস মওসুমে জি২পি[৪] এবং জি১২পি[৬] জীবাণুসমূহের উপস্থিতি দেখা গেছে যথাক্রমে মাত্র ১৫.৪% এবং ৩.১% রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর মধ্যে। কিন্তু ২০০৫-২০০৬ সালে জি২পি[৪] (৪৩.২%) জীবাণুর প্রকোপ ছিলো সবচেয়ে বেশি এবং জি১২পি[৬]-এর প্রকোপও ছিলো আগের থেকে বেশি (১১%)। সম্প্রতি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভ্যাকসিনসমূহ যেহেতু শুধুমাত্র পি[৮] জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে, সেহেতু যেসব স্থানে পি[৮] ছাড়া অন্যান্য জীবাণুর প্রকোপ রয়েছে সেসব স্থানে উল্লিখিত ভ্যাকসিনসমূহের কার্যকারিতা কেমন হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

বিশ্বব্যাপী ছোট শিশুদের মারাত্মক ডায়রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ‘এ’ শ্রেণীর রোটাভাইরাসমূহ। প্রতি বছর সারা বিশ্বে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু রোটাভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং চার লক্ষ ৪০ হাজার শিশু মারা যায়, যাদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের (১)। বাংলাদেশে রোটাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম-বয়সী ছয় হাজার থেকে ১৪,০০০ শিশু মারা যায় (২)।

ভিপি৭ (জি-জেনোটাইপ নির্দেশক) এবং ভিপি৪ (পি-জেনোটাইপ নির্দেশক) নামে দু'টি আউটার ক্যাপসিড প্রোটিনের ওপর ভিত্তি করে রোটাভাইরাস জীবাণুসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এ-পর্যন্ত মানুষ ও পশু-আক্রান্তকারী কমপক্ষে ১৬টি জি এবং ২৭টি পি জেনোটাইপের বিবরণ পাওয়া গেছে (৩,৪)। বিশ্বব্যাপী শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি রোটাভাইরাস এপিসোডের জন্য দায়ী মানুষ-আক্রান্তকারী প্রধান রোটাভাইরাসসমূহ হলো পি জেনোটাইপের পি[৮], পি[৪] এবং পি[৬]-এর সাথে সম্মিলিতভাবে জি১, জি২, জি৩, জি৪, এবং জি৯। বিভিন্ন ধরনের জি এবং পি জেনোটাইপের পরিবর্তনের ফলে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতার পরিবর্তন হয়েছে কি না তা বোঝার জন্য রোটাভাইরাস জেনোটাইপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ ও একটি শহুরে

এলাকায় রোটাভাইরাসের জ্বীন-সংক্রান্ত বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত পর্যায়ে রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ-গবেষণার বিস্তারিত প্রতিবেদন সম্প্রতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে (৫)।

রোটাভাইরাস 'এ'-এর ভিপি৬ জীবাণু সনাক্তকরণের জন্য ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৬ সালের মে পর্যন্ত সংগৃহীত ১৯,০৩৯টি মলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এগুলোর মধ্যে ৪,৬৪৪টি (২৪.৪%) নমুনায় উল্লিখিত জীবাণু পাওয়া যায়। ঢাকা ও মতলব হাসপাতালের সর্ভিলেন্সের আওতাধীন রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের একটি হিসাব সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে। রোটাভাইরাস সনাক্তকরণের গড় হার ঢাকায় ছিলো ২৫.২% এবং মতলবে ২৩.৩%।

*সারণি ১: রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগী: ঢাকা ও মতলব হাসপাতাল সার্ভিলেন্স (জানুয়ারি ২০০১-মে ২০০৬)*

| রোটাভাইরাস মওসুম* | ঢাকা | | মতলব | |
|---|---|---|---|---|
| | মোট পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা | রোটাভাইরাস পাওয়া গেছে সংখ্যা (হার) | মোট পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা | রোটাভাইরাস পাওয়া গেছে সংখ্যা (হার) |
| ২০০০-২০০১** | ৮৭৯ | ২১৪ (২৪.৩) | ৭১৫ | ২০২ (২৮.৩) |
| ২০০১-২০০২ | ১,৮২৪ | ৫৬৩ (৩০.৯) | ১,৬৬৫ | ৪২৮ (২৫.৭) |
| ২০০২-২০০৩ | ১,৮০৬ | ৪৫৮ (২৫.৪) | ১,৫৮৩ | ৩৩৮ (২১.৪) |
| ২০০৩-২০০৪ | ১,৭৮৬ | ৪৫৮ (২৫.৬) | ১,৪২৫ | ২৮১ (১৯.৭) |
| ২০০৪-২০০৫ | ২,৩৭৪ | ৫২১ (২১.৯) | ১,৫৪৭ | ৩৫০ (২২.৬) |
| ২০০৫-২০০৬ | ২,০৭০ | ৪৯২ (২৩.৮) | ১,৩৬৫ | ৩৩৯ (২৪.৮) |
| মোট | ১০,৭৩৯ | ২,৭০৬ (২৫.২) | ৮,৩০০ | ১,৯৩৮ (২৩.৩) |

*জুন মাসে শুরু হয়ে পরবর্তী বছরের মে মাসে শেষ হয়েছে

** রোটাভাইরাসের অসম্পূর্ণ মওসুম (জানুয়ারি-মে ২০০১)

রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের বয়স ছিলো এক মাস থেকে ৬৩.২ বছর পর্যন্ত (২০০১-২০০৫)। তাদের মধ্যবর্তী বয়স ছিলো ১০ মাস এবং গড় বয়স ছিলো ২২.৮ মাস। বেশিরভাগ (৯১%) রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর বয়স ছিলো দুই বছরের কম (চিত্র ১)। সংক্রমণের হার সবচেয়ে কম দেখা গেছে তিন মাসের কম-বয়সী এবং পাঁচ বছরের বেশি-বয়সী রোগীদের মধ্যে।

*চিত্র ১: রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের বয়স (২০০১-২০০৫)*

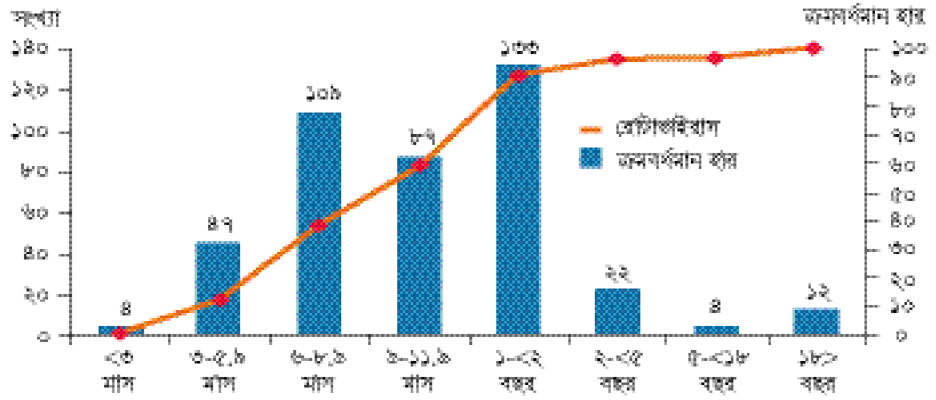


টাইপ-স্পেসিফিক-প্রাইমারনির্ভর আরটি-পিসিআর (৬-৭) দ্বারা ৪৭১টি (সব রোটাভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর ১০%) রোটাভাইরাস নমুনার জি এবং পি জেনোটাইপিং করা হয়, যার মাধ্যমে ছয়টি জি জেনোটাইপ (জি১, জি২, জি৩, জি৪, জি৮, জি৯) এবং পাঁচটি পি জেনোটাইপ (পি[৮], পি[৪], পি[৬], পি[৯], পি[১১]) সনাক্ত করা হয়। এ-পদ্ধতিতে যেসব নমুনার জেনোটাইপিং করা সম্ভব ছিলো না, সেগুলোকে নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স পদ্ধতিতে সার্থকভাবে জেনোটাইপিং করা হয়। সারণি ২-এ ঢাকা ও মতলবে সনাক্তকৃত রোটাভাইরাসের জি এবং পি জেনোটাইপের বণ্টন দেখানো হয়েছে। ঢাকা এবং মতলবে প্রাপ্ত রোটাভাইরাসের সংখ্যায় তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় নি (পি>০.০৫)। সর্বোপরি, সবচেয়ে বেশি প্রকোপ ছিলো জি১পি[৮] (৩৩.৮%) জেনোটাইপের এবং এর পরেই ছিলো জি৯পি[৮] (২৫.৩%), জি২পি[৪] (২০.২%) এবং জি৪পি[৮] (৮.৩%) জেনোটাইপের স্থান। মানুষকে আক্রমণকারী জি১২ (৫.৬%) এবং শুকরের মধ্যে পাওয়া যায় জি১১ (০.৬%) নামক এমন দু'টি রোটাভাইরাসের জীবাণু সনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো সাধারণত দেখা যায় না। জি১পি[৬], জি২পি[৬], এবং জি২পি[৮] এর মতো যেসব মিশ্রিত জীবাণু সচরাচর দেখা যায় না, সেগুলোও এখানে পাওয়া গেছে।

ঢাকা ও মতলব উভয় স্থানে রোটাভাইরাস জেনোটাইপের সংখ্যায় ব্যাপক ওঠা নামা লক্ষ করা গেছে। তবে গ্রামীণ ও শহুরে ব্যবস্থাপনার মধ্যে জেনোটাইপের বাৎসরিক হিসাবে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় নি (পি >০.০৫)। প্রধান জেনোটাইপসমূহের সময়ভিত্তিক বণ্টন চিত্র ২-এ দেখানো হয়েছে। ২০০১ সালে জি১পি[৮] জীবাণু সচরাচর কম দেখা গেছে, অথচ পরবর্তী বছরগুলোতে এ-ধরনের জীবাণু ছিলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী। তবে এগুলোর প্রভাব ২০০৫-২০০৬ সালে আবার কমে যায়। ২০০২-২০০৩ সালের প্রথম দু'টি রোটাভাইরাস মওসুমে জি৯পি[৮] জীবাণুসমূহ ছিলো অনেক প্রভাবশালী, তবে এর প্রভাব হঠাৎ করে আবার কমে যায়।

*সারণি ২: রোটাভাইরাসের জি এবং পি জেনোটাইপ: ঢাকা ও মতলব (জানুয়ারি ২০০১-মে ২০০৬)*

| জি টাইপ | পি টাইপ | রোটাভাইরাস স্ট্রেইনের সংখ্যা ও হার | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ঢাকা | মতলব | মোট |
| জি১ | পি[৬] | ১ (০.৪) | ২ (১.০) | ৩ (০.৬) |
| জি১ | পি[৮] | ৮৫ (৩১.৩) | ৭৪ (৩৭.২) | ১৫৯ (৩৩.৮) |
| জি২ | পি[৪] | ৫৫ (২০.২) | ৪০ (২০.১) | ৯৫ (২০.২) |
| জি২ | পি[৬] | ১ (০.৪) | ০ (০.০) | ১ (০.২) |
| জি২ | পি[৮] | ২ (০.৭) | ০ (০.০) | ২ (০.৪) |
| জি৪ | পি[৮] | ২৬ (৯.৬) | ১৩ (৬.৫) | ৩৯ (৮.৩) |
| জি৯ | পি[৬] | ৭ (২.৬) | ২ (১.০) | ৯ (১.৯) |
| জি৯ | পি[৮] | ৬৭ (২৪.৬) | ৫২ (২৬.১) | ১১৯ (২৫.৩) |
| জি১১ | পি[৬] | ১ (০.৪) | ০ (০.০) | ১ (০.২) |
| জি১১ | পি[৮] | ১ (০.৪) | ১ (০.৫) | ২ (০.৪) |
| জি১২ | পি[৬] | ১৬ (৫.৯) | ৫ (২.৫) | ২১ (৪.৫) |
| জি১২ | পি[৮] | ২ (০.৭) | ৩ (১.৫) | ৫ (১.১) |
| মিশ্রিত জি/পি | | ৮ (৩.০) | ৭ (৩.৫) | ১৫ (৩.২) |
| মোট | | ২৭২ (১০০.১) | ১৯৯ (৯৯.৯) | ৪৭১ (১০০.০) |

মোট জেনোটাইপের শতকরা হার ঢাকায় >১০০% এবং মতলবে <১০০%।

পরবর্তী দু'বছরে এগুলো আবার প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তবে ২০০৫-২০০৬ সালে পুনরায় তাদের ক্ষমতা কমে যায়। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে জি৪পি[৮] জীবাণুটি যেখানে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী ছিলো, সেখানে আলোচ্য গবেষণায় এটির প্রভাব কম দেখা গেছে (২০০৫-২০০৬ সালে মাত্র ১.২%)। ২০০৫-২০০৬ সালের রোটাভাইরাস মওসুমে জি২পি[৪] জীবাণুসমূহ ছিলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী (৪৩.২%)। যদিও তার আগের মওসুমসমূহে সেগুলোর তৎপরতা ছিলো কম (২০০১-২০০৫ সালে ১৫.৪%)। জি১২পি[৬] এবং জি১২পি[৮] জীবাণুসমূহ, যেগুলো সাধারণত দেখা যায় না, বাংলাদেশে প্রথম সনাক্ত করা হয় ২০০০-২০০১ মওসুমে এবং পরবর্তীতে ২০০৫-২০০৬ মওসুমে এসে এগুলো এ-অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জীবাণু হিসেবে পরিচিত হয় (১৩.৬%) (৮)।

*চিত্র ২: ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রধান প্রধান রোটাভাইরাস জেনোটাইপের সময়ভিত্তিক পরিবর্তন*

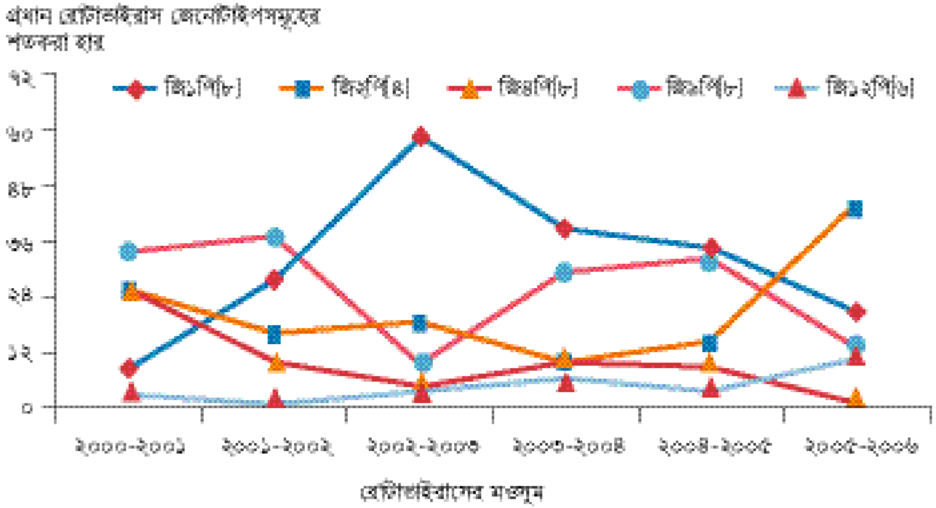


প্রতিবেদন: ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন এবং ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (রেফারেন্স নং ভি২৭-১৮১-১৭৬) এবং বাংলাদেশ সরকার/ডেট রিলিফ গ্রান্ট এইড (গ্রান্ট নম্বর জিআর-০০৪১০)

## *মন্তব্য*

আমাদের গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো রোটাভাইরাস জীবাণুসমূহের ভিপি৭ (জি জেনোটাইপ) এবং ভিপি৪ (পি জেনোটাইপ)-এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি পরিচিত রোটাভাইরাসমূহ (জি১, জি২, জি৪ এবং জি৯) আমরা আমাদের এ-গবেষণার মাধ্যমে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আলোচ্য গবেষণা থেকে প্রাপ্ত রোটাভাইরাস-সংক্রান্ত ফলাফল বাংলাদেশে সম্পাদিত পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মসমূহের ফলাফলের সাথে তুলনা করা হয়েছে (৮)। এটি পরিস্কারভাবে বোঝা গেছে যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে রোটাভাইরাস জেনোটাইপের বিভিন্নতার পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত রোটাভাইরাসের যে জীবাণুটি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে সেটি ছিলো জি৪ (জেনোটাইপিং করা গেছে এমন রোটাভাইরাসের ৪৭%)। কিন্তু সেটি পর্যায়ক্রমে কমে যেতে থাকে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেটি এখন কম দেখা যায় (২০০৫-২০০৬ পর্যন্ত ১.২% ছিলো)। অন্যদিকে জি২ জীবাণুসমূহের সংখ্যা ২০০৪ থেকে ২০০৫ সালের রোটাভাইরাস মওসুম পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে (১৯৯২-১৯৯৭ পর্যন্ত ১৯.৫% এবং ২০০১-২০০৫ পর্যন্ত ১৬.২%)। কিন্তু ২০০৫-২০০৬ সালের রোটাভাইরাস মওসুমে এসে এগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাব

বিস্তারকারী জেনোটাইপ হিসেবে আবির্ভূত হয় (৪৩.২%)।

তিনটি জি১১ জীবাণু, যেগুলো সাধারণত শুকরের মধ্যে দেখা যায়, আলোচ্য গবেষণায় সেগুলো মানুষের মধ্যে সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে শুকর সাধারণত খামারে লালন-পালন করা হয় না এবং সেজন্যে শুকর বা অন্য কোনো পশুর ওপর জেনোটাইপ-সংক্রান্ত কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত করা হয় নি। তাই পশুর মধ্যে অবস্থানকারী জি১১-এর মতো ভিপি৭ এবং মানুষের মধ্যে অবস্থানকারী পি[৮] অথবা পি[৬] জীবাণুসমূহ সনাক্ত করার পর প্রশ্ন উঠেছে যে, এগুলো মানুষ এবং পশুর মধ্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন প্রকার রোটাভাইরাস জীবাণুর সংমিশ্রণ কি না? এ-গবেষণার সুপারিশমালায় রোটাভাইরাস-সার্ভিলেন্সের আওতা বৃদ্ধি করে পশুকেও এর মধ্যে আনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সচরাচর দেখা যায় না তবে গৃহপালিত পশুর মধ্যে থাকতে পারে এমন রোটাভাইরাসের জীবাণুসমূহ সনাক্ত করার জন্য পানির নমুনা, বিশেষ করে বন্যার সময় সংগৃহীত পানির নমুনা পরীক্ষা করার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে অবস্থানকারী জি১২ নামে একটি রোটাভাইরাস জীবাণু যা সচরাচর খুব কম দেখা যায়, তা বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো সনাক্ত করা হয়েছে। জি১২ জীবাণু প্রথম সনাক্ত করা হয় ফিলিপাইনে ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে। এর ১০ বছরের অধিক সময় পরে এটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমাদের গবেষণায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ডায়রিয়া রোগীর মধ্য থেকে জি১২ জীবাণুটি সনাক্ত করা হয়, সর্বশেষ রোটাভাইরাস মওসুমে (২০০৫-২০০৬) যার পরিমাণ ১৩.৬%-এ এসে দাঁড়ায়। সুতরাং জি১২ জীবাণুর এই উত্থানের ফলে সম্ভাবনাময় সার্ভিলেন্সের আওতায় নতুন আরটি-পিসিআর রোগ-নির্ণয়ক প্রাইমারের মাধ্যমে জি১২ জীবাণুসমূহ সনাক্তকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

২০০৫-২০০৬ সালের এক পি জেনোটাইপিং বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্থানীয় রোটাভাইরাসের মধ্যে পি[৮] নয় এমন রোটাভাইরাস ছিলো ২১.৯%। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, ২০০৫-২০০৬ রোটাভাইরাস মওসুমে পি[৮] নয় এমন জীবাণুর সংখ্যা ছিলো মোট জীবাণুর অর্ধেকেরও বেশি (৫৬.৮%)। বর্তমানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রোটাটেক (মার্ক অ্যান্ড কোং) এবং রোটারিক্স (গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন) নামক ভ্যাকসিন দু'টিকে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী জি জেনোটাইপের বিরুদ্ধে বেশ কার্যকর দেখা গেছে, তবে পি জেনোটাইপের বিরুদ্ধে কার্যকর কি না তা নিশ্চিত করা হয় নি (৯,১০)। এই ভ্যাকসিনগুলো পি[৮]-এর জন্য তৈরি, তবে পি[৮] নয় এমন জীবাণুর বিরুদ্ধে এগুলো কার্যকর কি না তাও পরীক্ষা করা উচিত, বিশেষ করে যেসব স্থানে এমন জীবাণুর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। বাংলাদেশে রোটাটেক ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষার কাজ যেহেতু খুব শীঘ্রই শুরু হবে, এর ফলাফল ব্যাখ্যার জন্য আমাদের গবেষণা থেকে রোটাভাইরাস জীবাণুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের গবেষণা থেকে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে রোটাভাইরাস এখনো ডায়রিয়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। রোটাভাইরাস রোগের প্রকোপ এত ব্যাপক হওয়ার ফলে জরুরি ইন্টারভেনশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে শিশুমৃত্যু

রোধ করার জন্য। রোটাভাইরাস সংক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিভিন্ন ধরনের মুখে খাওয়ার স্যালাইন পানিশূন্যতা দূরীকরণে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। শরীরের পানি ও লবনমিশ্রিত তরল পদার্থের (ফ্লুড এবং ইলেক্ট্রোলাইট) ঘাটতি যদি মুখে খাওয়ার স্যালাইনের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব না হয়, অথবা রোগীর শরীর যদি মারাত্মকভাবে পানিশূন্য হয়ে পড়ে বা হঠাৎ মারাত্মকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে অনতিবিলম্বে তাকে শিরায় স্যালাইন (আইভি) দিতে হবে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ওষুধ, অথবা লোপারমাইড, অ্যান্টিকলিনারজিক এজেন্টস, বিস্মাথ সাবসেলিসাইলেট, অ্যাডজরবেন্টস, অথবা ল্যাক্টোব্যাসিলাসসমৃদ্ধ কম্পাউন্ডের মতো নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। নতুন কিছু গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক দিয়ে ডায়রিয়ার ফলে সৃষ্ট পানিশূন্যতাজনিত ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়। অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পয়ঃপ্রণালী যেহেতু ভাইরাসের সংক্রমণ খুব বেশি ঠেকাতে পারে না, সেহেতু রোটাভাইরাস-সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর একটি ভ্যাকসিন দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকা এবং ইউরোপে বর্তমানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভ্যাকসিনসমূহের কার্যকারিতা সফলভাবে পরীক্ষা করার পর এগুলো দিয়ে রোটাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে অনেক বড় আশার উদ্রেক হয়েছে। তবে বাংলাদেশে বা এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্য কোথাও এগুলো এখনো পরীক্ষা করা হয় নি।

*তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন*

## একটি ঘোষণা

জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন উপলক্ষে আইসিডিডিআর,বিতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৬-৭ মে ২০০৭ তারিখে। এ-বছর সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে বাংলাদেশে জিংক-চিকিৎসা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধনসংক্রান্ত গবেষণার ওপর আলোকপাত করা।

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী ব্যাক্তিগণ ২০ এপ্রিল ২০০৭ এর মধ্যে নাম নিবন্ধন করতে পারেন। যোগাযোগ: নজরাতুন নাঈম মোনালিসা, ইনফরমেশন ম্যানেজার, সুজি প্রজেক্ট, আইসিডিডিআর,বি, মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ; ফোন: +৮৮০-২-৮৮৬ ০৫২৩-৩২/২৫৩৯, +৮৮০-২-৯৮৮৬৪৯৭ (সরাসরি); মোবাইল: ০১৭১৩০৯৩৮৮৪; ফেক্স: ৮৮০-২-৮৮১১৫৬৮; ইমেল: monalisa@icddrb.org, ওয়েবসাইট: www.icddrb.org

# সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সর্ম্পকে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

*জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০০৬-ফেব্রুয়ারি ২০০৭*

| জীবাণুনাশক ওষুধ | *শিগেলা* (সংখ্যা = ১৭৩) | *ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৬৮০) |
|---|---|---|
| ন্যালিডিক্সিক এসিড | ২৭.৭ | পরীক্ষা করা হয় নি |
| মেসিলিনাম | ৯৪.২ | পরীক্ষা করা হয় নি |
| এম্পিসিলিন | ৫৭.২ | পরীক্ষা করা হয় নি |
| টিএমপি-এসএমএক্স | ৩৩.৫ | ২.৮ |
| সিপ্রোফ্লোক্সাসিন | ৯৯.৪ | ১০০.০ |
| টেট্রাসাইক্লিন | পরীক্ষা করা হয় নি | ৫৭.২ |
| ইরিথ্রোমাইসিন | পরীক্ষা করা হয় নি | ৬.৫ |
| ফুরাজোলিডোন | পরীক্ষা করা হয় নি | ০.১ |

*প্রতিমাসে প্রাপ্ত* ভি. কলেরি ও১, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০০৬-ফেব্রুয়ারি ২০০৭*

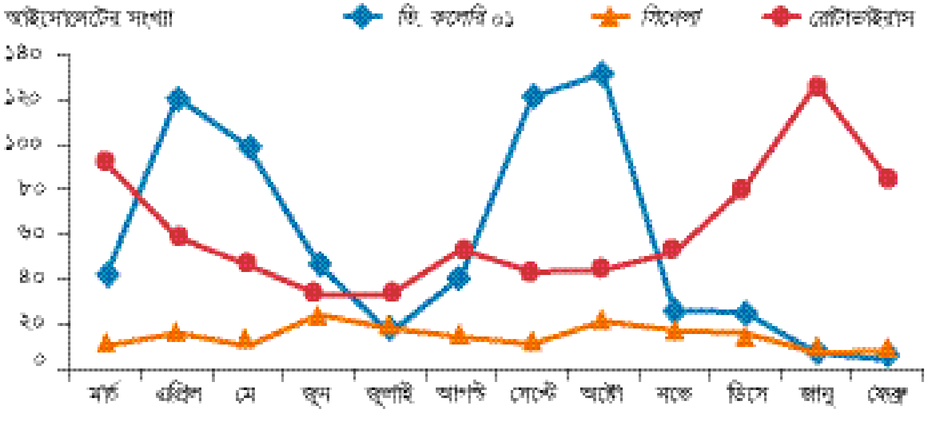

*১৭৯টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬*

| ওষুধ | প্রতিরোধের ধরন | | |
|---|---|---|---|
| | প্রাইমারি (সংখ্যা=১৬৪) | একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৫) | মোট (সংখ্যা=১৭৯) |
| স্ট্রেপটোমাইসিন | ৪৬ (২৮.০) | ৮ (৫৩.৩) | ৫৪ (৩০.২) |
| আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ) | ১৬ (৯.৮) | ৬ (৪০.০) | ২২ (১২.৩) |
| ইথামবিউটাল | ৮ (৪.৯) | ২ (১৩.৩) | ১০ (৫.৬) |
| রিফামপিসিন | ১৭ (১০.৪) | ৫ (৩৩.৩) | ২২ (১২.৩) |
| এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন) | ৬ (৩.৭) | ৩ (২০.০) | ৯ (৫.০) |
| অন্যান্য ওষুধ | ৫৯ (৩৬.০) | ৯ (৬০.০) | ৬৮ (৩৮.০) |

() শতকরা হার  * একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

*জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬ (সংখ্যা=১২)*

| জীবাণূনাশক ওষুধ | সংবেদনশীল (%) | কম সংবেদনশীল (%) | রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা (%) |
|---|---|---|---|
| এজিথ্রোমাইসিন | ৯১.৭ | ৮.৩ | ০.০ |
| সেফট্রিয়াক্সোন | ১০০.০ | ০.০ | ০.০ |
| সিপ্রোফ্লোক্সাসিন | ০.০ | ৮.৩ | ৯১.৭ |
| পেনিসিলিন | ০.০ | ০.০ | ১০০.০ |
| স্পেক্টিনোমাইসিন | ৯১.৭ | ৮.৩ | ০.০ |
| টেট্রাসাইক্লিন | ০.০ | ০.০ | ১০০.০ |
| সেফিক্সিম | ১০০.০ | ০.০ | ০.০ |

*পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে* স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬*

| জীবাণুনাশক ওষুধ | পরীক্ষিত (সংখ্যা) | সংবেদনশীল সংখ্যা (%) | কম সংবেদনশীলতা* সংখ্যা (%) | রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা* সংখ্যা (%) |
|---|---|---|---|---|
| এম্পিসিলিন | ১৩ | ১৩ (১০০.০) | ০ (০.০) | ০ (০.০) |
| কোট্রাইমোক্সাজোল | ১২ | ২ (১৬.৭) | ১ (৮.৩) | ৯ (৭৫.০) |
| ক্লোরামফেনিকল | ১৩ | ১৩ (১০০.০) | ০ (০.০) | ০ (০.০) |
| সেফট্রিয়াক্সোন | ১৩ | ১৩ (১০০.০) | ০ (০.০) | ০ (০.০) |
| সিপ্রোফ্রোক্সাসিন | ১৩ | ১২ (৯২.৩) | ১ (৭.৭) | ০ (০.০) |
| জেন্টামাইসিন | ১৩ | ১ (৭.৭) | ০ (০.০) | ১২ (৯২.৩) |
| অক্সাসিলিন | ১৩ | ১৩ (১০০.০) | ০ (০.০) | ০ (০.০) |

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর (শহরাঞ্চল) এবং টাঙ্গাইলের মির্জাপুর (গ্রামীণ) এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

*পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে* এস. টাইফি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬*

| জীবাণুনাশক ওষুধ | পরীক্ষিত (সংখ্যা) | সংবেদনশীল সংখ্যা (%) | কম সংবেদনশীলতা* সংখ্যা (%) | রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা* সংখ্যা (%) |
|---|---|---|---|---|
| এম্পিসিলিন | ১২ | ৬ (৫০.০) | ০ (০.০) | ৬ (৫০.০) |
| কোট্রাইমোক্সাজোল | ১১ | ৬ (৫৪.৫) | ০ (০.০) | ৫ (৪৫.৫) |
| ক্লোরামফেনিকল | ১২ | ৬ (৫০.০) | ০ (০.০) | ৬ (৫০.০) |
| সেফট্রিয়াক্সোন | ১২ | ১১ (৯১.৭) | ০ (০.০) | ১ (৮.৩) |
| সিপ্রোফ্লোক্সাসিন | ১২ | ১২ (১০০.০) | ০ (০.০) | ০ (০.০) |

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর।

*ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ভাইরোলোজি টিমের সদস্যবৃন্দ*

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কেন্দ্রের পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

**আইসিডিডিআর,বি**
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

**সম্পাদকমণ্ডলি:**
স্টিফেন পি. লুবি
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

**সম্পাদনা বোর্ড:**
চার্লস পি. লারসন
এমিলি গারলি

**যাঁরা লেখা দিয়েছেন:**
এমিলি গারলি
দীপক কুমার মিত্র
মোস্তাফিজুর রহমান

**কপি সম্পাদনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা:**
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

**বাংলা অনুবাদ:**
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
নেছার আহমাদ

**ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:**
মাহ্‌বুব-উল-আলম